গল্প, যুক্তি ও উদাহরণের সাহায্যে **ঈমান সিরিজ**

পরকাল ও ভাগ্য কী

সিদ্দিক স্বপন

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

মৃত্যু আসলে কী	৯
জন্ম ও মৃত্যু	১৪
মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়	১৬
কবর কেমন জায়গা	১৯
হাশরের দিনের ঘটনাগুলো কীভাবে ঘটবে	২৮
মৃত্যুর পর আমরা কীভাবে আবার জীবিত হব	৩১
কে পচে যাওয়া হাড়গুলোকে জীবন দান করবেন	৩৮
ভালো-মন্দ কাজের বিচার হবে কীভাবে	৩৮
হাশরের দিনে বিশ্বনবি কি আমাদের সঙ্গে থাকবেন	৪২
আমরা পুলসিরাত পার হব কীভাবে	৪৭
জান্নাত দেখতে কেমন	৫০
কে জাহান্নামে যাবে	৫৬
কদর বা ভাগ্য কী	৬৮
সবকিছুর ভাগ্য আছে	৭২
আমরা যা কিছু করব, সবই কি ভাগ্যের লিখন	৭৫
কেন কেউ ধনী আর কেউ কেউ গরিব	৭৭
কেন কেউ দেখতে সুন্দর আর কেউবা কুৎসিত	৮২
আল্লাহ যেহেতু সব জানেন, তাহলে এতে আমার দোষ কী	৯০
সর্বশেষ কিছু কথা	৯৪

মৃত্যু আসলে কী

আমার ছোটোবেলার কথা বলছি। তখন আমার বয়স ছয়। সেদিন আমি ও আমার বন্ধু মনির একটা বকুলগাছের নিচে বকুল ফলের বীজ কুড়াচ্ছিলাম। স্কুলে আমাদের তখন যোগ-বিয়োগ শেখার জন্য এই বীজগুলো স্যার নিয়ে যেতে বলেছিলেন। ওগুলো দিয়ে খুব সহজেই অঙ্ক করে ফেলা যেত। যেমন : পাঁচের সাথে পাঁচ যোগ করলে কত হবে? সহজভাবে পাঁচটা বীজের সাথে আরও পাঁচটা যোগ করে গুনলে দশটা পাওয়া যাবে। কত সহজভাবে করা হয়ে যেত অঙ্ক!

বকুল ফুলের সুগন্ধে চারদিকটা মৌ মৌ করছিল।

এমন সময় দেখলাম, অনেকজন লোক একসাথে হেঁটে আসছে। বেশির ভাগের পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবি। এর মধ্যে কয়েকজন তাদের কাঁধে একটা কাঠের খাটিয়া বহন করছিলেন। খাটিয়াটি একটা সাদা কাপড় দিয়ে মোড়ানো ছিল। সবাই উচ্চৈঃস্বরে 'আশহাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু' কালিমটা পাঠ করছিল। আমিও এই কালিমাটা পারতাম। আম্মু ছোটোবেলাতেই আমাকে পাঁচটি কালিমা মুখস্থ করিয়েছিলেন।

সেদিন আমি প্রথম মৃত্যু সম্পর্কে জেনেছিলাম। আমার বয়স তখন ছয় বছর। আমি তাকিয়ে ছিলাম খাটিয়া বহনকারী লোকদের দিকে। তারা লাশকে দাফনের উদ্দেশ্যে কবরস্থানে নিয়ে যাচ্ছিল।

মনির আমাকে বলল—'চল, ওই বাড়িটিতে যাই।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম—'কোন বাড়িতে?'

সে উত্তর না দিয়েই আমার হাত ধরে টেনে যে বাড়িটি থেকে খাটিয়াটি বহন করে নিয়ে আসা হয়েছে, সেখানে নিয়ে গেল।

আমি দেখলাম, মহিলারা চিৎকার দিয়ে মাটিতে গড়াগড়ি করে কাঁদছে। এর আগে এভাবে আমি কাউকে কাঁদতে দেখিনি। অনেক পুরুষও ছিল। তারা মহিলাদের চুপ করতে বলে নিজেরাও কাঁদছিল। এর আগে আমি বয়স্ক কোনো লোককে কখনোই কাঁদতে দেখিনি।

তাদের কান্নাকাটি, রোনাজারি দেখে মনিরও কাঁদতে লাগল। আমার চোখেও পানি এলো। আমি জানি না, কেন কাঁদছিলাম। কিন্তু এটা বুঝেছিলাম— তাদের এমন কিছু হারিয়েছে, যা আর কখনো তারা ফিরে পাবেন না।

মনির খুবই চালাক একটা ছেলে। দুনিয়ার এমন কিছু নেই—যা সে জানত না। তাকে আমরা সবজান্তা শমসের নামে ডাকি তার বুদ্ধির কারণে। আমি তাকে যা-ই জিজ্ঞেস করতাম—ভুল কি শুদ্ধ, সে একটা না একটা উত্তর দিতই দিত।

‘মনির, ওই বাক্সে কী ছিল।’

‘গাধা, ওটা কোনো বাক্স ছিল না।’

‘কী তাহলে ওটা?’

‘লাশের খাটিয়া।’

‘লাশের খাটিয়া কী?’

‘তুই জানিস না, মানুষ মারা যায়?’

‘জানি তো। স্কুলে স্যার বলেছিলেন।’

‘মানুষ মারা গেলে ওই খাটিয়ায় করে তাকে রেখে আসা হয়।’

‘কোথায়?’

‘কোথায় আবার? কবরস্থানে।’

‘কবরস্থান কী?’

‘যেখানে অনেক কবর থাকে।’

‘কবর কী?’

‘মানুষ মারা গেলে তাকে মাটি দেওয়া হয়, জানিস না?’

‘মাটি দেওয়া হয়!’

‘হ্যাঁ, মাটি দেওয়া হয়। প্রতি শবেবরাতের রাতে আব্বু আমাকে কবরস্থানে নিয়ে যান জিয়ারতের জন্য। আর আম্মা কুরআন পড়েন, দুআ করেন।’

‘একটা মানুষকে মাটি দেওয়া হয়?’

‘মানুষ না। লাশকে মাটি দেওয়া হয়।’

‘লাশ কী?’

‘তুই জানিস না?’

‘না।’

‘তুই মরে গেলে তুইও লাশ।’

‘আমি মরতে চাই না।’

‘সবাইকেই একদিন মরতে হবে।’

‘সবাইকেই?’

‘হ্যাঁ, সবাইকে।’

‘কিন্তু কেন?’

‘এটাই নিয়ম।’

‘আচ্ছা, কবরে কী হয়? যাদের কবরে রেখে আসা হয়, তারা ওখানে কী করে?’

‘লোকটা ভালো কাজ করলে আল্লাহ তাকে জান্নাত দেবেন।’

‘এভাবেই জান্নাতে যেতে হয়?’

‘না মরলে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।’

‘তাহলে তো কবর ভালো জায়গা।’

‘হ্যাঁ, যারা জান্নাতে যাবে তাদের জন্য ভালো জায়গা। কিন্তু...’

আমরা চুপ করে খাটিয়া বহনকারী লোকদের দেখতে লাগলাম। একসময় রাস্তা থেকে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। আর হঠাৎ করেই যেন নীরবতায় ছেয়ে গেল চারদিকটা। সুনসান নীরবতা। টুঁ শব্দটা পর্যন্ত নেই।

একটু পর মনির আমার কাঁধে হাত ভর করে বলল—‘গত সপ্তাহে যা বৃষ্টি হলো না।’

‘হুম। বেশ কদিন স্কুল মিস হয়ে গেছে, তাই না?’

‘হ্যাঁ। ফুটবল মাঠটা পানিতে ভরে গিয়েছে।’

‘হুম। দেখেছিলাম।’

‘আর অনেক ব্যাঙাচি আছে সেখানে।’

‘ব্যাঙাচি কী?’

‘হাদারাম! ব্যাঙাচি চিনিস না? আরে, ব্যাঙের বাচ্চা। ওগুলো বড়ো হয়ে ব্যাঙ হয়।’

‘তাই নাকি? ’

‘চল, দেখতে যাই। যাবি?’

‘চল।’

ওইদিন পলিথিনে আমরা কাদা মাখামাখি করে অনেকগুলো ব্যাঙাচি ধরেছিলাম। খুব মজা করেছিলাম। অবশ্য মাঝেমধ্যে রাগারাগি ও ঝগড়াও হয়েছিল; কিন্তু অনেক মজা হয়েছিল।

এর মধ্যেই পলিথিনের ব্যাগে একটা ব্যাঙাচি মরে যাওয়ায় আমরা সবগুলোকে পানিতে ছেড়ে দিয়েছিলাম, যেন সেগুলো বেঁচে যায়। এতে মৃত্যু কী, তা হালকা টের পেয়েছিলাম।

এরপর আর মৃত্যু, লাশের খাটিয়া কিংবা কবরস্থান নিয়ে মনিরের সঙ্গে কোনোদিন কথা হয়নি আমার।

খুব সম্ভবত এক কি দুবার, আমি মনিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—‘তাহলে জান্নাতে যাওয়ার আগে মানুষ কবরে কতদিন থাকে?’

সে আমাকে প্রজাপতির ডিম কীভাবে লার্ভায় পরিণত হয়, কীভাবে লার্ভা কোকুন তৈরি করে, এরপর কোকুন কেটে বড়ো প্রজাপতি বের হয়ে আসে—এসবের গল্প শুনিয়েছিল। আমি কিছুই বুঝিনি। প্রজাপতির সঙ্গে জান্নাতের কী সম্পর্কে, তাও বুঝতে পারিনি।

মৃত্যু নিয়ে আর আমাদের মধ্যে কোনো আলাপ হয়নি। মনির মৃত্যু সম্পর্কে আগে থেকেই জানত। কারণ, মনিরের বাবা মারা গিয়েছিলেন। মৃত্যু কী জিনিস, তা সে অনেক ছোটো থেকেই জানে। আমি কিছুই জানতাম না মৃত্যুর ব্যাপারে।

ছোট্ট লেজার লাইটের মতো সন্ধ্যাতারাগুলোর ঝিকমিক করে জ্বলার দৃশ্য দেখলেই ঘুম পায় আমার। এমনই এক নাদান বালক আমি।

রাতের বেলা উইপোকাগুলো রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের দলবেঁধে ওড়াউড়ি করত। যেন কারও বিয়ের নৃত্যে তারা অংশগ্রহণ করেছে। আমি মনভরে তাদের এই ওড়ার দৃশ্য দেখতাম। সন্ধ্যাতারাগুলোর দিকেও একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম।

এত সবের ভিড়ে মৃত্যু কী, মৃত্যুর পর কবরে কী হয়, মারা গেলেই কেউ কীভাবে জান্নাতে যাবে—এই প্রশ্নগুলো আমার মাথায় কখনোই আসেনি। এরপর মনিরের সঙ্গে সেদিন মৃত্যু কী, তা জানলাম। তখন আমার বয়স ছয়।

আর এতদিনে আমি মৃত্যু সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি। কিন্তু তথাপি এমন অনেক বিষয় আছে, যা মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত, কিন্তু আমি জানি না।

উদাহরণ দেবো? যেমন : আমি এখনও জানি না, মরে যাওয়া বলতে আসলে কী বোঝায়।

মারা যাওয়া আসলে কী? সত্যি বলতে, এই প্রশ্নের উত্তরটা এখনই যদি পাওয়া যেত, তাহলে আমি খুব খুশি হতাম। তবে একদিন না একদিন আমি এটা খুঁজে বের করবই। তা করতে হলে আমাকে মারা যেতে হবে। তখন বুঝব, মারা যাওয়া জিনিসটা আসলে এটা।

কিন্তু আমি যা বুঝব, তা তোমাকে বলা সম্ভব হবে না। কারণ, আমি আর এখানে থাকব না। তুমি কি বুঝতে পেরেছ?

মৃত্যু আসলে কী? এটা বোঝার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, আমাদের জন্মগ্রহণের ব্যাপারে ভাবা।

জানি, তুমি অবাক হয়েছ। ভাবছ, আলোচনা করছি মৃত্যুর কিন্তু কথা বলছি জন্ম নিয়ে। অথচ মৃত্যু আর জন্মের মধ্যে অনেক দূরত্ব; মৃত্যুর সাথে জন্মের সম্পর্কে কী?

আছে। সম্পর্ক আছে।

জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে আসা আর মৃত্যুর মাধ্যমে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার মাঝে অনেক মিল আছে।

জন্ম ও মৃত্যু

যদি মায়ের গর্ভে থাকা কোনো বাচ্চাকে বলা সম্ভব হতো, তুমি একদিন এই জায়গা ছেড়ে চলে যাবে! আমি নিশ্চিত, বাচ্চাটা যারপরনাই অবাক হতো! ভয়ে কাঁপত। বিশ্বাসই করতে চাইত না।

'কি! আমি এই জায়গা ছেড়ে চলে যাব?'

'হ্যাঁ, চলে যাবে। তুমি জন্ম নেবে।'

'কি! জন্ম নেব?'

'হ্যাঁ। বাকি সব বাচ্চার মতো তুমিও জন্ম নেবে। তুমি এই জায়গা ছেড়ে এমন এক জায়গায় যাবে, যেখানে চোখ মেলে দেখার মতো অনেক কিছু আছে।'

'আমার ভয় লাগছে। আমি জন্ম নিতে চাই না। এই জায়গাটিই অনেক সুন্দর।'

'তুমি চাও বা না চাও, জন্ম তোমাকে নিতেই হবে। কিন্তু ভয় পেয়ো না। জন্ম নেওয়ার পর তুমি এমন এক জায়গায় যাবে, যা এখানকার তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুন্দর। পৃথিবীর সঙ্গে এই জায়গার তুলনায় হয় না।'

'তুমি কি নিশ্চিত?'

'অবশ্যই। আমি নিশ্চিত। তুমি এটা বুঝবে যখন এই অন্ধকার জায়গা ছেড়ে পৃথিবীতে যাবে। চোখ মেললেই নীল আকাশ, রাতের ঝিকিমিকি তারা, রঙিন ফুল...আরও কত কী যে দেখবে!'

'নীল আকাশ, রাতের তারা, রঙিন ফুল—এসব সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আমার কল্পনাতেও এসব কোনোদিন আসেনি। তুমি আমাকে যা বলছ, আমি বুঝতেই পারছি না এসব কী জিনিস! আমার ভয় লাগছে।'

মানুষ যা জানে না, তা-ই ভয় করে। যেমন : আমরা জিন, ভূত সম্পর্কে জানি না বলেই এসব ভয় পাই। জন্ম নিতে হবে, এই খবরটা একটা বাচ্চাকে খুবই

ভীত করে তুলবে। কারণ, সে জন্মের পর যেখানে যাবে সেই নতুন জগৎ সম্পর্কে তার কোনো ধারণাই নেই। সে জানে না পৃথিবী কি!

তাই তার জন্য জন্মের অর্থ হলো মৃত্যু। তাহলে আমরা বুঝলাম, মায়ের পেটে অবস্থানকারী বাচ্চার জন্য জন্ম নেওয়া সবচেয়ে ভালো। কেননা, সে খুব ছোটো ও অন্ধকার একটা জায়গায় থাকে।

আমার মনে হয়, কোনো বাচ্চা যদি জানত—জন্মের মাধ্যমে সে এত সুন্দর একটা জায়গা পৃথিবীতে আসতে চলেছে, তাহলে জন্ম নেওয়ার সাথে সাথে কান্নাকাটি করত না; বরং চোখ মেলেই কিউট হাসি হেসে বলত—'ওয়াও! পৃথিবী এত সুন্দর!'

আমাদের অবস্থাও মায়ের পেটের বাচ্চাটির মতো। এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস সবকিছুকে আমরা ভালোবেসে ফেলেছি। নীল আকাশ, রাতের তারা, সুন্দর সুন্দর ফুল, রুপালি ঝরনা—সব আমাদের কাছে অনিন্দ্যসুন্দর লেগেছে। এই জীবনকে আমরা খুব সুন্দর উপভোগ করছি। আর তাই যখনই বলা হয়, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাব—আমরা কষ্ট পাই। আমাদের মন দুঃখভরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আমরা ব্যথাতুর হৃদয়ে বলি—'এত সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে?'

ঠিক মায়ের পেটে থাকা জন্ম না নেওয়া বাচ্চাটির মতোই আমরা ভয় পাই মৃত্যুর কথা শুনলে। আসলে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে চাই না। অনন্ত অসীম সময় ধরে এখানে বাস করতে চাই।

আল্লাহ মায়ের পেটের বাচ্চাটিকে ওই ছোটো, অন্ধকার জগতে বেশি দিন রাখতে চান না। তাই জন্মগ্রহণের মাধ্যমে তাকে এই সুন্দর পৃথিবীতে পাঠান।

ঠিক তেমনই, আমরাও মৃত্যুর মাধ্যমে আরেকটা পৃথিবী, আরেকটা জগতে যাব, যা এই পৃথিবীর তুলনায় অনেক অনেক বেশি সুন্দর। এই পৃথিবীর তুলনায় অনেক গুণ বড়ো।

মায়ের গর্ভের তুলনায় এই পৃথিবী যেমন অনেক সুন্দর, অনেক বড়ো; আমাদের মৃত্যুর পর আমরা জান্নাতে যাব, ইনশাআল্লাহ। আর জান্নাত এত বেশি সুন্দর ও বিশাল যে, এটা অকল্পনীয় ও অবিশ্বাস্য।

আর এটাই হলো মারা যাওয়া বলতে যা বোঝায়। বুঝেছ?

মৃত্যুর পর আমাদের কী হয়

এই প্রশ্নের উত্তর শোনার পর তুমি চমকে যাবে। অবাক হবে। তবে একটু পরেই বুঝতে পারবে আমার কথাই আসলে ঠিক।

আমরা যখন মারা যাই, আমাদের আসলে কিছুই হয় না। আমরা আগের মতোই থাকি। যা ঘটে, তা হয় আমাদের শরীরের সাথে। কিন্তু আমাদের রুহ বলেও একটা জিনিস আছে। এটাই আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করে।

আমি জানি, তুমি বেশ অবাক হয়েছ। আচ্ছা ঠিক আছে। চলো, এবার তোমাকে একটা উদাহরণের মাধ্যমে এই বিষয়টা বুঝিয়ে দিই। আশা করি, তুমি বুঝতে পারবে আমি কী বলতে চেয়েছি।

তুমি নিশ্চয় নভোচারী দেখেছ? না মানে কার্টুন বা মুভির বাইরে সরাসরি নিজের চোখে নভোচারী দেখোনি, তাই না?

ব্যাপার না। এটা কোনো সমস্যা না। আমিও সরাসরি কোনো নভোচারী দেখিনি।

তো, যখন নভোচারীরা রকেটে করে মহাবিশ্বে যায়, তাদের একটা বিশেষ পোশাক পরিধান করতে হয়। এর কারণ হলো—মহাবিশ্বের অবস্থা পৃথিবীর মতো না। সেখানে টি-শার্ট, প্যান্ট পরে থাকা যাবে না। থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু ঘটবে।

যেহেতু মহাবিশ্ব একটা আলাদা জগৎ। এটা পৃথিবীর মতো না। পৃথিবীর মতো কোনো কিছুই সেখানে নেই। না আছে বাতাস, না আছে মাটি। তুমি সেখানে হাঁটাহাঁটিও করতে পারবে না। তাই পৃথিবীর কাপড়চোপড় পরে সেখানে থাকা যাবে না।

এই বিশেষ পোশাকের ভেতরে নভোচারীরা থাকে। তাদের দেখাই যায় না। পুরো শরীর ঢেকে থাকে। যেন এই পোশাকটাই হলো নভোচারী। কিন্তু যখন তারা পৃথিবীতে ফিরে আসে, তখন এই পোশাকটা খুলে নেওয়া হয়।

এবার বলো তো, পোশাক পরে থাকা নভোচারী আর পোশাক খুলে ফেলার পর নভোচারীর কোনো পার্থক্য আছে? একই ব্যক্তি না?

অবশ্যই একই ব্যক্তি।

পোশাক না থাকলেও তিনি একজন নভোচারী, তাই না?

অবশ্যই।

তাহলে পোশাকটা কী?

পোশাকটাকে কি আমরা নভোচারী বলতে পারি?

অবশ্যই না। কারণ, এটা একটা পোশাকমাত্র। হ্যাঁ, পোশাকটা সুন্দর। কিন্তু এটা একটা প্রাণহীন বস্তু। এটাকে কেউ পরিধান না করলে এর কোনো মূল্যই নেই।

এবার এই উদাহরণের সাথে মিলিয়ে তোমার শরীরের দিকে দেখো।

আল্লাহ সর্বপ্রথম আমাদের রুহ সৃষ্টি করেছেন। জন্মগ্রহণের পূর্বে রুহগুলো আলমে আরওয়া তথা রুহের জগতে থাকে। যখন আমাদের দুনিয়ায় পাঠানো হয়, তখন আমাদের রুহকে তো একটা সুন্দর অবয়ব দেওয়ার প্রয়োজন হয়। আর আমাদের মায়ের গর্ভে তখন আমাদের জন্য উপযুক্ত একটা অবয়ব আল্লাহ সৃষ্টি করেন।

এই অবয়বের কোনো কিছু ধরার জন্য হাত থাকে। হাঁটাহাঁটির উপযুক্ত পা থাকে। শোনার জন্য কান থাকে। দেখার জন্য থাকে চোখ আর ঘ্রাণ যেন আমরা নিতে পারি, তাই থাকে নাক...

আমরা এই সুন্দর শরীর নিয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করি, কিন্তু এই শরীর আমরা নই। যেমন নভোচারী তার পোশাক পরে থাকেন মাত্র। পোশাক কখনোই নভোচারী না। ঠিক তেমনই আমাদের রুহ এই শরীরের মধ্যে অবস্থান করে মাত্র, এই শরীর রুহ না। রুহের পোশাক হলো শরীর।

এই পৃথিবীতে আমাদের সময় শেষ হয়ে গেলে, শরীর নামক পোশাকটা খুলে নেওয়া হবে। এরপর আমরা আবার রুহের জগতে চলে যাব।

পৃথিবীতে চলার জন্য শরীর নামক যে পোশাক আমাদের পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজরাইল এসে তা খুলে নেবে। কারণ, এটার আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। কোনো দরকারেই লাগবে না। এটা ঠিক ওই নভোচারীর পোশাকের মতো। রকেটে করে মহাবিশ্বে যাওয়ার সময় তাকে এটা পরিয়ে দেওয়া হয়। আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার সাথে সাথেই সেটা খুলে নেওয়া হয়।

এরপর আমাদের রুহ চলে যায় কবরের জগতে। এটা এক আলাদা জগৎ।

এই পৃথিবীতে আসার পূর্বে যেমন আমরা মায়ের পেটে নয় কি দশ মাস ছিলাম, ঠিক তেমনি কবরেও আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে থাকতে হবে। হাশরের বিচারের আগপর্যন্ত। হাশর কী, তা নিশ্চয় তোমার মনে আছে। পুনরুত্থানের পর সবার বিচার দিবস অনুষ্ঠিত হবে। এটাকেই হাশর বলে।

আল্লাহ আমাদের মায়ের পেটে একা ছেড়ে দেননি। ঠিক তেমনি কবরে যাওয়ার জন্যও একা ছেড়ে দেবেন না। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামিন। জগৎসমূহের রব। রুহের জগৎ, এই পৃথিবী, কবরের জগৎ, জান্নাত—সবকিছুর মালিক তিনি।